আষাঢ় শ্রাবণে
টুটে পানি
তার মর্ম
পরে জানি

চাষের কথা

জ্যৈষ্ঠে শুখো
আষাঢ়ে ধারা
শস্যের ভার
না সহে ধরা

বর্ষ ১৬ ।। সংখ্যা ৪ ।। জুলাই-অগস্ট ২০১৩ ।। ১৬ আষাঢ় -১৪ ভাদ্র ১৪১৯

আগাছা নিড়োনোর যাদুযন্ত্র

ধানজমি থেকে আগাছা নিড়োনোর যন্ত্র এল। সাধারণ বাজার চলতি আগাছা নিড়োনোর যন্ত্র ওজনে বেশ ভারি। কিন্তু এই যন্ত্র বেশ হাল্কা ও সহজে চালানোও যায়। মেয়েরাও এই যন্ত্র নিয়ে সহজে কাজ করতে পারে।

নতুন পাতা

যন্ত্র বানিয়েছে তামিলনাড়ুর কুম্ভকোনমের এস কার্তিকেয়ন। এক নাগাড়ে এক ঘণ্টা কাজ করতে পারে যন্টি। এর জন্য লাগে এক লিটার পেট্রল। কাদা কাদা মাটিতে এই যন্ত্র ধানজমিতে এক ফুট অব্দি গভীরে যায়। শুখাজমির জন্য চাকা বদলে নেওয়াও যেতে পারে।

যেখানে এক একর জমি থেকে আগাছা নিড়োতে ১২ থেকে ১৫ জনের ৫-৬ ঘণ্টা সময় লাগে। সেখানে একজন লোক ৫-৬ ঘণ্টা সময়ের ভেতর এই কাজ করে দিতে পারে। এই যন্ত্র তামিলনাড়ু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, তামিলনাড়ু রাজ্য কৃষি বিভাগ ও নানা গবেষণাকেন্দ্রে পরখ করা হয়েছে। ■■

ভাষাবদল : অনিকেত

যোগাযোগ :
এস কার্তিকেয়ন
ওম শক্তি অ্যাগ্রি ইন্ডাস্ট্রিজ
৯/১ লাল বাহাদুর শাস্ত্রী রোড
কুম্ভোকোনম ৬১২ ০০১
ই মেল: karthi_omsakthi@yahoo.co.in

দ্য হিন্দু ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১

অন্য পাতায়

আবহাওয়া পরিবর্তন ও কৃষি : ২

সরকারের কৃষির কয়েক কথা

রাসায়নিক সারের আমদানি

চাষের জন্য যথাক্রমে ৯০ ও ১০০ শতাংশ ফসফেট ও পটাশ সার আমদানি করতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। কারণ দেশে সীমিত পরিমাণ রক ফসফেট থাকলেও তা গুণমানে খুব উন্নত নয়। উদাহরণ পুরুলিয়া ফস। তবে ইউরিয়া উৎপাদনে দেশ স্বনির্ভর হতে পারে। এজন্য সরকার নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। একথা গত ২৩ অগস্ট রাজ্যসভায় জানিয়েছেন সার ও রসায়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত জেনা। মাননীয় মন্ত্রীর এই কথা কেন সারের দাম ক্রমশ বাড়ছে তার খানিক ইঙ্গিত দেয়। কারণ বেশিরভাগ সারের জন্য আমাদের পরের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় সরকার হয়তো খুঁজছে। কিন্তু বিকল্পের জন্য আমাদের তরফ থেকেও উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

সুস্থায়ী কৃষির প্রসারে সরকার

জলবায়ু বদলের প্রভাব ইতিমধ্যেই ভারতের কৃষিতে পড়তে শুরু করেছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চ (আইসিএআর) ফসল উৎপাদনে জলবায়ু বদলের প্রভাব নিয়ে একটি বিস্তৃত সমীক্ষা করে এর প্রমাণ পেয়েছে। আইসিএআর বলছে, এর ফলে ২০২০ সালের মধ্যে শুধু সেচসেবিত ধানের উৎপাদন ৪ শতাংশ ও বৃষ্টি নির্ভর ধানের ৬ শতাংশ ফলন কমে যেতে পারে।

আইসিএআর এজন্য ন্যাশনাল প্রজেক্ট ইনিসিয়েটিভ অন ক্লাইমেট রিজিলিয়্যান্ট অ্যাগ্রিকালচার (জলবায়ু বদল সহনশীল কৃষি বিষয়ক জাতীয় উদ্যোগ) নামে একটি কর্মসূচি নিয়েছে। এছাড়া ন্যাশনাল মিশন অন সাসটেনেবল অ্যাগ্রিকালচার (জাতীয় সুস্থায়ী কৃষি মিশন)-এর একটি নথি তৈরি করা হয়েছে যা জলবায়ু বদল বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর কাউন্সিল নীতিগতভাবে সমর্থন জানিয়েছে। এই মিশন সুস্থায়ী কৃষির ১০টি প্রধান দিক নির্দিষ্ট করেছে। যা চারটি কার্যক্রম যেমন গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রযুক্তি নির্বাচন, প্রয়োগ ও উৎপাদন এবং পরিকাঠামো ও দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হবে। বর্তমানে কৃষি বিষয়ক যেসব প্রকল্প, পরিষেবা, কার্যক্রম সরকারের রয়েছে তার মাধ্যমেই এই মিশন রূপায়ণ করা হবে। এসব কথা রাজ্যসভায় জানিয়েছেন খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী তারিক আনোয়ার।

জানেন কি

জৈব কৃষি ও সরকার

সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জৈব কৃষির প্রসার ঘটাচ্ছে বলে, রাজ্য সভায় খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীতারিক আনোয়ার জানিয়েছেন। এইসব প্রকল্পগুলি হল ন্যাশনাল প্রজেক্ট অন অরগ্যানিক ফার্মিং (এনপিওএফ), ন্যাশনাল হর্টিকালচার মিশন (এনএইচএম), রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (আরকেভিওয়াই), নেটওয়ার্ক প্রজেক্ট অন অরগ্যানিক ফার্মিং ইত্যাদি। এনএইচএম এবং আরকেভিওয়াই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যগুলিকে সাহায্য করা হচ্ছে যাতে তারা চাষি গোষ্ঠী যারা জৈব কৃষি কাজ করছে তাদের জমি সার্টিফিকেশন (বা শংসিতকরণ) এবং তাদের জমিতে চাষের প্রয়োজনীয় জৈব সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির জন্য সহায়তা করতে পারে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, এখনো অবধি ৫২.১ লক্ষ হেক্টর জমি জৈব সার্টিফিকেশন হয়েছে। এনএইচএম-এর মাধ্যমে আরো যে সহায়তা করা হচ্ছে তা হল প্রতি হেক্টরে ১০ হাজার টাকা করে, জনপ্রতি সর্বাধিক ৪ হেক্টর জমিতে জৈব পদ্ধতিতে বাগিচা ফসল চাষে সহায়তা। ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচোসার তৈরির ইউনিট তৈরিতে জনপ্রতি মোট খরচের ৫০ শতাংশ বা সর্বাধিক ৩০ হাজার টাকা সহায়তা দলগতভাবে চাষিরা জৈব পদ্ধতিতে ফসল ফলালে তাদের ৫০হেক্টর জমি অবধি জৈব সার্টিফিকেশনে জন্য ৫ লক্ষ টাকা সহায়তা। এনপিওএফ-এর মাধ্যমে যে সহায়তা করা হচ্ছে তা হল :

ফল ও সবজি বাজারের বর্জ্য, কৃষিজ বর্জ্য-এর মাধ্যমে কম্পোস্ট সার উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য মোট খরচের ৩৩ শতাংশ বা সর্বাধিক ৬০ লক্ষ টাকা নাবার্ডের মাধ্যমে ভরতুকি। জৈব সার বা জৈব কীটনাশক উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির জন্য ২৫ শতাংশ বা সর্বাধিক ৪০ লক্ষ টাকা ভরতুকি। ■■

সম্পাদকীয়

আবহাওয়া পরিবর্তন ও কৃষি, পটভূমি পশ্চিমবঙ্গ

ড. স্বদেশ মিশ্র

কৃষি-অর্থনীতির নতুন পাঠ

চাহিদা-জোগান, বিপণন, উৎপাদন ব্যয় কৃষকের আয়, ছোটজোত-বড়জোত, ক্ষেতমজুর-ভূমি সংস্কার মিলে যে কৃষি অর্থনীতির পঠন পাঠন, তার ভেতর মনে হয় এক রূপান্তর আসছে। কারণ, কৃষির ওপর নিয়ন্ত্রণ কৃষকের হাত থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। সার-তেলের দোকানির খবরদারিতো আগেই ছিল, এখন তার সঙ্গে এসেছে বিবিধ বিচিত্র উপসর্গ। কোম্পানির জিনশস্যের বীজ কেনায় কৃষকের বাধ্য হওয়া, কৃষকের নিজের বীজ রাখার ওপর নিষেধের ফতোয়া, চাষির পুরো ফসল কেনায় কোম্পানির লোভের হাতছানি, পাল্টে দিচ্ছে দেশের কৃষি-মানচিত্র।

ফলে অর্থনীতির পাঠমালারও অদলবদল হবে। বদলে যাবে লেখচিত্র, বিশ্লেষণ তথা রাশিবিজ্ঞানের একাগ্রতার কেন্দ্র। কিন্তু কেমন হবে সেই পাঠ? আগামী দিনের অর্থনীতিকে খালি বহুজাতিকের সুখ-দুঃখে চিন্তামগ্ন হতে হবে না তো!

সম্পাদক

সেপ্টেম্বর -অক্টোবর ২০১৩

আমাদের দেশ ভারতবর্ষের কৃষি উৎপাদন ক্রমশ নিম্নমুখী। মাথাপিছু গড়ে খাদ্য ১৯৯৫ সালের ২০৭ কেজি থেকে কমে ২০০৬ সালে দাঁড়িয়েছে ১৮৬ কেজিতে। সব ধরনের ইনপুট বা উপকরণ সরবরাহ ও ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও এই অধোগতি রোধ তেমনভাবে সম্ভব হচ্ছেনা। এর জন্য বিশেষজ্ঞ মহল আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা ও কৃষি গবেষণায় প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট উদ্যোগের অভাবকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

বিগত তিন দশক ধরে যে বিষয়টি সমগ্র বিশ্বকে আলোড়িত করে চলেছে বা

> মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হওয়ার স্বাভাবিক তারিখ ৭ জুনের পরিবর্তে দাঁড়িয়েছে ১৩জুন। কিন্তু... বৃষ্টি বিদায় নেওয়ার তারিখ (১০ অক্টোবর) মোটামুটি অপরিবর্তিতই রয়েছে ।

গভীরভাবে ভাবাচ্ছে তা হল বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যা। আবহাওয়া কিংবা জলবায়ু পরিবর্তন এখন বৈজ্ঞানিকদের কল্পকাহিনী নয়, রূঢ় বাস্তব। বিশেষত ভারতবর্ষের মতো ক্রান্তীয় অঞ্চলে আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রধান শিকার হল কৃষি তথা কৃষি-অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তা।

আবহাওয়া পরিবর্তন ও কৃষির উপর তার বিরূপ প্রভাব সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলা করতে গেলে কতগুলি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান বা ঘটনার স্থান কিংবা অঞ্চলভিত্তিক পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ধারণ করা।
- বিভিন্ন ফসল ও তার চাষ এবং সামগ্রিকভাবে কৃষির উপর তার সুনির্দিষ্ট প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- আগামীদিনের পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণ করা।
- আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে স্থান কিংবা এলাকা অনুযায়ী ফসল ও তার জাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান বা ঘটনার স্থান কিংবা অঞ্চলভিত্তিক পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি:

বৃষ্টিপাত

উত্তরে দার্জিলিং থেকে দক্ষিণে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থিত মোট১১টি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের দীর্ঘ ১২০ বছরের (১৮৯১-২০১০) বৃষ্টিপাতের তথ্য বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে যে বিষয়গুলি প্রকট হচ্ছে তা হল, দীর্ঘ ১২০ বছরের হিসাব বাদ দিয়ে যদি আমরা শেষের ৬০ বছরের অর্থাৎ সাম্প্রতিক অতীত ও বর্তমানের (১৯৫১-২০১০) বৃষ্টিপাতের তথ্য পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে

- দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা গত ছয় দশকে আর তেমনভাবে দেখা যাচ্ছে না।
- তরাই এবং ডুয়ার্সে বৃষ্টিপাত কমার লক্ষণ নেই।
- উত্তরবঙ্গের দক্ষিণাংশে মালদায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সামান্য বেড়েছে।
- কিছুটা কম পরিমাণে হলেও বহরমপুরে বৃষ্টিপাত কমার ধারা অব্যাহত আছে।
- দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য অংশ বিশেষত পশ্চিমাঞ্চল ও উপকূলবর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিন্তা

তাপমাত্রা

তাপমাত্রার বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সমান হারে না হলেও, রাজ্যের সর্বত্রই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দৈনিক সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দৈনিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রার তুলনায় বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কমছে দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ফারাক।১৯৭০ -এর পর তাপমাত্রা বৃদ্ধি তরান্বিত হয়েছে, দ্রুততর হয়েছে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে।

মৌসুমী ঋতুর কার্যকাল

কলকাতা তথা দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হওয়ার স্বাভাবিক তারিখ ৭ জুনের পরিবর্তে দাঁড়িয়েছে ১৩জুন। কিন্তু মৌসুমী বৃষ্টি বিদায় নেওয়ার তারিখ (১০ অক্টোবর) মোটামুটি অপরিবর্তিতই রয়েছে। ফলে এ অঞ্চলে মৌসুমী ঋতুর মেয়াদ প্রায় এক সপ্তাহ কমেছে।

বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠে জলের উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে।

খরা

গত শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গ খরার কবলে পড়েছে মোট ১৬ বার। যার মধ্যে ১৯০১-১৯৫০-এর মধ্যে এ রাজ্য খরা কবলিত হয়েছে ৫ বার যা দ্বিতীয় ৫০ বছরে বেড়ে হয়েছে ১১ বার। বর্তমান দশকে এ রাজ্য একাধিকবার খরার কবলে পড়েছে যার মধ্যে ২০১০ সালের খরার ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ খরার ঘটনা বাড়ছে।

বন্যা

খরার মতো এ রাজ্যে বন্যার ঘটনাও বাড়ছে জ্যামিতিক হারে।

সাম্প্রতিক পরিবর্তন

(১৯৭৬-২০১০) বিগত ৩৪ বছরে এ রাজ্যের আবহাওয়ার আরো অনেকগুলি পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে কৃষি তথা খাদ্য উৎপাদনের উপর।

যেমন:

- কমছে শিশির জমার পরিমাণ
- বাড়ছে আবহাওয়ার অস্থিরতা বা খামখেয়ালিপনা।
- ক্রমশ অদৃশ্য হচ্ছে ঋতুশৃঙ্খলা ও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ।

- বিভিন্ন ঋতুতে ব্যতিক্রমী ঘটনা এখন নিত্যনৈমিত্তিকতায় পর্যবসিত হচ্ছে।
- শীতকালের ব্যাপ্তি কমেছে।
- শীতের তীব্রতা কমেছে।
- দৈনিক সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দৈনিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রার চেয়ে দ্রুততর বাড়ছে।
- জানুয়ারি মাসের তাপমাত্রা বেড়েছে।
- অন্যান্য মাসের তাপমাত্রা বেড়েছে।
- শীতের গড় তাপমাত্রা বিগত ১৫ বছরে ০.১°-০.৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়েছে।
- শীতকালে শৈত্যপ্রবাহ (Cold Spell) -র তুলনায় উষ্ণপ্রবাহের সংখ্যা, তার দৈর্ঘ্য ও তীব্রতা বাড়ছে।
- শীতকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও বৃষ্টিপাতের দিনের সংখ্যা দুইই কমছে।
- সাধারণভাবে শীতকাল উষ্ণ, শুষ্ক ও স্বল্প দৈর্ঘ্যে পরিণত হচ্ছে। গ্রীষ্ম দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

মৌসুমী ঋতু বা বর্ষাকাল

- কার্যকারী মৌসুমী ঋতুর ব্যাপ্তি সঙ্কুচিত হচ্ছে।
- সব থেকে আগে (২৬ মে ২০০৯) এবং সব থেকে দেরিতে (২৬ জুন ১৯৮৩) মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হওয়ার ঘটনা ঘটেছে গত ২৮ বছরের মধ্যেই।
- মৌসুমী ঋতুর মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব একটা পরিবর্তিত না হলেও এই ঋতুর বিভিন্ন মাসের বৃষ্টিপাতের খামখেয়ালিপনা বা variability বাড়ছে।
- মৌসুমী ঋতুর প্রথমার্ধে বৃষ্টিপাত কিছুটা কমার ও দ্বিতীয়ার্ধে বাড়ার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।
- মৌসুমী ঋতুর মাঝখানে বৃষ্টিপাতের দীর্ঘ বিরতির ঘটনা প্রায়শই ঘটছে।য়
- মৌসুমী ঋতুর দ্বিতীয়ার্ধে বৃষ্টিপাতের দিনের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। এর ফলে বন্যা ও ভূমিক্ষয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৌসুমী ঋতুর প্রত্যাবর্তন বা হেমন্তকালের আবহাওয়া অনেক বেশি অস্থির হচ্ছে।

কৃষির ওপর প্রভাব

সন্দেহাতীতভাবে কৃষিই হল মানুষের সব থেকে বেশি আবহাওয়া -নির্ভর জীবিকা বা কর্মকাণ্ড। তাই আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয় কৃষি তথা খাদ্যনিরাপত্তার ক্ষেত্রে কতগুলি সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে করবে।

যেমন:

- প্রতিটি কৃষি মরশুমে শস্যহানির ঘটনা বাড়ছে।
- রবি মরশুম ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে বিনিময়ে বাড়ছে প্রাক্-মৌসুমী ও খরিফ ঋতুর মেয়াদ।
- রবি-মরশুমে অতিমাত্রায় তাপমাত্রা -সংবেদনশীল সকল প্রকার শস্যের উৎপাদনই ব্যাহত হচ্ছে।
- বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, উপকূলবর্তী অঞ্চলে কৃষি ও কৃষি-নির্ভর জীবন ও জীবিকা ক্রমশ অনিশ্চিত ও বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়েছে। একই প্রভাব পড়েছে এই অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের জীবন ও জীবিকায়।
- প্রাক্ মৌসুমী ও মৌসুমী ঋতুতে বৃষ্টিপাতের অনিয়মিত বণ্টনের জন্য পাট ও ধানের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

শীতের গড় তাপমাত্রা বিগত ১৫ বছরে ০.১°-০.৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়েছে।

- মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তনকালের আবহাওয়া অতিমাত্রায় পরিবর্তনশীল হওয়ায় এই মরশুমের চাষ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে,তেমনি রবি চাষের শুরুও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।
- আগাছার উপদ্রব বাড়ছে
- ফসলে রোগপোকার আক্রমণ বাড়ছে
- কৃষিজমি কমছে
- জলসংকট বাড়ছে
- মাটির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ভৌমজলের তাপমাত্রা বাড়ছে।
- উপকূলবর্তী অঞ্চলে মাটির লবণাক্ততা বাড়ছে ।
- ফসলের শেকড় পচার সম্ভাবনা বাড়ছে।
- মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাসের সম্ভাবনা বাড়ছে।

কীভাবে মোকাবিলা করা যাবে

এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে দুভাবে:

প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ এবং মানিয়ে চলা বা আবহাওয়া-নির্ভর কর্মকাণ্ডকে পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া। প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ হল, গ্রিনহাউস গ্যাস বা তাপ শোধনকারী গ্যাসসমূহের নির্গমন যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই,আজ থেকে সমস্ত প্রকার তাপশোধনকারী উপাদানের নির্গমন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া গেল, তাহলেও বাতাসে ইতিমধ্যে যে পরিমাণ গ্যাস নির্গত হয়েছে তা আগামী পাঁচ দশক ধরে এই উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবে। তাই আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে আবহাওয়া-নির্ভর কর্মকাণ্ডের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে চলার পদ্ধতি:

আবহাওয়ার সঙ্গে কৃষিকে মানিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার আগে এ বিষয়ে আমাদের বর্তমান অবস্থান ঠিক কোথায় তা একবার দেখি।

কৃষিতে যতগুলি উপকরণ বা ইনপুটের প্রয়োজন হয় তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল আবহাওয়া বা আবহাওয়ার আনুকূল্য। কিন্তু প্রকৃতিদত্ত এই ইনপুট যেহেতু পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না, বা বলা যেতে পারে বিনে পয়সার ইনপুট তাই এর ব্যবহার সম্পর্কে আমরা মোটেই যত্নবান নই। বাস্তবচিত্র হল, আমরা অধিকাংশ ফসলের চাষ করি ওই ফসলের জীবনচক্রের বিভিন্ন অবস্থায় আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের সঠিক চাহিদা এবং যে সময় বা যেখানে ওই ফসলের চাষ করছি ওই জায়গার,ওই সময়ের স্বাভাবিক আবহাওয়া ওই চাহিদা মেটাতে সক্ষম কিনা তা না জেনেই। এর ফলে, একদিকে যেমন উৎপাদন কম হচ্ছে,অপরদিকে তেমনই আবহাওয়ার উৎপাদনশীলতার সর্বোচ্চ বা যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। তাই আবহাওয়া নামক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতিদত্ত ইনপুটকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হলে, সর্বাগ্রে প্রয়োজন ফসলের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের স্বাভাবিক চক্রের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটানো এবং প্রতিটি ফসলের চাষের স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে দেখতে হবে,কোথায় এবং কখন ওই সমন্বয় ঘটছে। তাহলেই পাওয়া যাবে আবহাওয়ার সর্বাধিক আনুকূল্য। একে বলে Climate Adaptation।

এরপর আসি Climate Variability Adaptation-এর প্রসঙ্গে। কোনো জায়গার Climate বা জলবায়ু হল, ওই জায়গার আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান ও ঘটনার দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছরের গড় চিত্র। তার মানে এই নয়, প্রতি বছর এই গড় চিত্রটির পুনরাবৃত্তি ঘটবে। ধরা যাক, কলকাতার বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৬০০ মিলিমিটার। তাই বলে ধরে নেওয়া যাবে না প্রতি বছরই কলকাতায় ১৬০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হবে। কোনো বছর তা ১৪০০ মিলিমিটার আবার কোনো বছর ১৮০০ কিংবা ১৯০০ মিলিমিটার হতে পারে। তেমনই কোনো বছর শীত একটু আগে শুরু হল কিংবা দেরিতে শুরু হল। এসবই হল Climate Variability। এরকম দু -এক বছরের ঘটনাকে আবহাওয়া বা জলবায়ু পরিবর্তন আখ্যা দেওয়া অনুচিত।

বর্তমান আবহাওয়ার সঙ্গে কৃষিকাজকে ঠিকমতো মানিয়ে চলতে এবং সর্বোচ্চ সুযোগ গ্রহণ করতে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি সঠিকভাবে অবলম্বন করা প্রয়োজন:

- বর্তমানে রাজ্যের যেসব জায়গায় যে সময় যেসব ফসলের চাষ করছি তার যথার্থতার সঠিক বিশ্লেষণ করতে হবে
- ওইসব ফসলের বিভিন্ন অবস্থায়: আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের চাহিদা ও ওখানকার আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের গড় তথ্যের সমন্বয়ের নিরিখে। সমন্বয়ের অভাব ঘটলে এলাকা ও ফসল ভিত্তিক Crop Weather Calendar নতুন করে সাজাতে হবে।
- যেসব এলাকায় বর্তমান চাষ করা ফসল আবহাওয়ার যথার্থ আনুকূল্যে পাচ্ছেনা, সেখানে বিকল্প ফসল চাষের পরিকল্পনা করতে হবে যা আবহাওয়ার সঙ্গে মানানসই এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হবে।
- প্রয়োজনে প্রতিটি কৃষি ঋতুতে শস্যক্রমে এবং শস্য সমন্বয়ে পরিবর্তন ঘটাতে হবে।
- Climate Variability মোকাবিলার জন্য যথাযথ Agrotechnique উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হবে।

• মহকুমা স্তরে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য ও শস্যরক্ষাসহ প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি কৃষি-পরামর্শ প্রতিদিন স্থানীয় প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। যাতে কৃষকরা অনুকূল আবহাওয়ার সুযোগের সদ্ব্যবহার ও প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে ফসলকে যথাসম্ভব রক্ষা করে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতাকে সর্বোচ্চ জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।

• কৃষক, সম্প্রসারণ কর্মী, কৃষি ও আবহাওয়া বিশেষজ্ঞের মধ্যে অনেক বেশি সমন্বয় ঘটাতে হবে।

আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলা:

আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে কৃষিকে খাপ খাইয়ে নিতে হলে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা দরকার:

• অঞ্চলভিত্তিক আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান কিংবা ঘটনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শস্য পরিকল্পনা, ফসলের জাত নির্বাচন ও আবহাওয়াভিত্তিক শস্যসূচি বা Crop Weather Calender রচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

• প্রয়োজনের তাগিদ অনুসারে, নতুন ফসল ও সঠিক জাত উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করতে হবে। কৃষি গবেষণাকেও এই পথে অগ্রসর হতে হবে।

• বিভিন্ন ফসলের উপর আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করে যথাযথ Agrotechnique উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হবে।

• ব্লক ও মহকুমাস্তরের আবহাওয়া, জমি ও ফসলের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে দৈনিক কৃষি-আবহাওয়া সুপারিশ, মহকুমা কৃষি অফিস থেকে কৃষকদের জন্য নিয়মিত প্রচার করতে হবে।

• পুকুর, জলাশয় ইত্যাদির সংস্কার করে, তাতে বর্ষার সময়ে অতিরিক্ত জল ধরে রেখে ভূপৃষ্ঠে জলের সঞ্চয় বাড়িয়ে ক্ষুদ্রসেচের প্রসার ও এলাকা বাড়াতে হবে।

• রবি ও প্রাক্-মৌসুমী ঋতুতে যখন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম, সেইসব মরশুমে বোরো ধানের মতো অত্যধিক জল ব্যবহারকারী ফসলের চাষ না করে গম, ডালশস্য ও বিভিন্ন ধরনের তৈলবীজের চাষ করতে হবে। এর ফলে অনেক বেশি এলাকাকে অল্প সেচের মাধ্যমে চাষের আওতায় আনা যাবে, বিশেষত যেসব এলাকায় জলের অভাব আছে।

• খরা, বন্যা ও সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকার জন্য পৃথক পৃথক পদ্ধতি, পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ করতে হবে

• প্রতিটি ব্যতিক্রমী ঘটনার মোকাবিলার জন্য আগে থেকেই এলাকা, সময় ও ফসল ভিত্তিক আপৎকালীন পরিকল্পনা বা Contingency Plan তৈরি করে রাখতে হবে। যাতে এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হলে শুরুতেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

• প্রয়োজনে ভূমির ব্যবহারের চরিত্র বদলাতে হবে।

• বিভিন্ন এলাকায় জমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও উপযোগিতা বাড়ানোর জন্য জমির সঠিক সংস্কার বা Land Shaping করা প্রয়োজন।

• কৃষক ও সর্বসাধারণের মধ্যে আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণও এই পরিবর্তনকে মানিয়ে চলা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

পরিশেষে বলি আবহাওয়া পরিবর্তনশীল। পৃথিবীর ইতিহাস অতীতে বহুবার এই পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করছে। যারা এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি, তাদের অস্তিত্ব মুছে গেছে পৃথিবী থেকে। তাই এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া ছাড়া বিকল্প পথ নেই।

অপরদিকে একথা ভুললে চলবে না যে, আগামীদিনে রাজ্যের বর্ধিত জনসংখ্যার ক্ষুন্নিবৃত্তির দায় যে আমাদেরই। ■■

লেখক প্রাক্তন কৃষি-আবহবিদ ও পশ্চিমবঙ্গ বৃষ্টিপাত নিবন্ধকরণ নিয়ামক।

উৎস : লিপি নাগরিক ।। অগস্ট ২০১২ ।। প্রথমবর্ষ ।। দশম সংখ্যা

জলবায়ু বদল শীর্ষক বিশদ-পাঠ

গ্লোবাল ওয়ার্মিং বিজ্ঞান রাজনীতি || অতীশ চট্টোপাধ্যায়
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

গ্লোবাল ওয়ার্মিং পরিবেশ বিপর্যয় || দীপককুমার দাঁ জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী

জলবায়ু পরিবর্তন এক অশনি সংকেত ||
সম্পাদনা ড.বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবেশ আকাদেমি

সবুজের অভিযান || বড়বাজার, চন্দননগর

জলবায়ু বিতর্ক || মানসপ্রতিম দাস
জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও তার বিপদ || দিলীপ বসু
জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী

বিশ্বায়িত উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন ||
সম্পাদনা বিপ্লবভূষণ বসু
স্কুল অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, কলকাতা

বদলে যাচ্ছে জলবায়ু || অংশুমান দাস
ডিআরসিএসসি

নতুন।। বই

গৃহপালিত পশুপাখি থেকে সংসারে আয় বাড়তে পারে। তবে, তা কাজে লাগাতে জানতে হবে। জানতে হবে, আয়ের জন্য কোন্ প্রাণীকে বাছব, প্রাণীপালনের নিয়ম কী, ব্যাবসা কেমনভাবে করব, উৎপাদন খরচ কমানো যাবে কীভাবে ইত্যাদি। আমরা এসব শেখাব, প্রশিক্ষণ দেব। মুরগি পালনের এই বই সেই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেরই অংশ। আশা করি সকলের কাজে আসবে।

সাইজ (৫"X ৭") সাইজে ১৪ পয়েন্টে হোয়াইট প্রিন্টে ছাপা, পাতা সংখ্যা ১৬, মূল্য : ১৫ টাকা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ২০১২

আমাদের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে ধারাবাহিক মতামত ও মূল্যায়ন দরকার যাতে এর আরো উন্নতি করা যায়। এর জন্য একটি স্বাধীন মূল্যায়ন সংস্থা গঠন করা জরুরি। ইন্ডিয়ান রুরাল ডিভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১২-১৩ আনুষ্ঠানিক প্রকাশের সময় একথা বলেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ। রিপোর্টটি তৈরি করেছে আইডিএফসি ফাউন্ডেশন সহ আরো কিছু নামজাদা গবেষণা ও সামাজিক সংস্থা মিলে। প্রকাশ অনুষ্ঠানে যোজনা কমিশনের সদস্য ড. মিহির শাহ বলেন, জল হল জীবন ও জীবিকার প্রধান উৎস। সেই কারণে জলের বিভিন্ন ব্যবহার সার্বিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে করতে হবে। একাজে জন-সমূহ এবং সরকরের অংশগ্রহণ খুবই প্রয়োজন। রিপোর্টটিতে খুব সঙ্গতভাবেই কৃষি-জীবকা প্রসঙ্গে একট বড় অংশ লেখা হয়েছে যা সংক্ষেপ করলে দাঁড়ায় :

- কৃষি থেকে আয় পরিবারর পক্ষে যথেষ্ট হয়। বিশেষত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের ক্ষেত্রে। এই চাষিরা মোট জমির ৮৫ শতাংশের মালিক। এর মধ্যে আবার শুখা এলাকার চাষিরা অর্ধেকের বেশি জমির মালিক।
- এদের জন্য নতুন চাষের মডেল দরকার। এছাড়া শুখা এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ছোটদানা শস্য(মিলেট) চাষফের শুরু করা দরকার কারণ, এই ধরনের শস্য স্থানীয় এলাকার উপযুক্ত, শক্ত-সমর্থ, পুষ্টিকর। এইসব শস্য গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহ করা দরকার।

- বিভিন্ন ধরনের সামূহিক বা যৌথ চাষ ব্যবস্থা চালু করা যাতে, ঋণ, ভরতুকি, জমির মালিকানা, সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছোট ও প্রাপ্তিক চাষির নানা দিক থেকে সহায়তা হতে পারে।
- অন্ধ্রপ্রদেশের ২০ লক্ষ চাষি সাফল্যের সঙ্গে সামুহিক ব্যস্থাপনার মাধ্যমে সুস্থায়ীভাবে কৃষিকাজ করছে। এতে তাদের খরচ বহুল পরিমাণে কমছে। কারণ ফসল তৈরি ও তা বাঁচানোর জন্য তাদের রাসায়নিক সার, বিষ ব্যবহার করতে হচ্ছে না। এ ধরনের চাষের প্রসার আরো ব্যাপকভাবে করতে হবে।
- চাষের জন্য মোট মিষ্টি জলের ৮০ শতাংশের ব্যবহার হয়। জলকে আরো বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। জল ও তার উৎসকে (ভূ-জল ও ভূ পৃষ্ঠ জল উভয়কেই) সামাজিক সম্পদ বলে স্বীকৃতি দিতে হবে।
- এসবই খুব ভালো ভালো কথা। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি। কেন্দ্রীয় সরকার হই হই করে পূর্ব ভারতে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব সংগঠিত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। এই সবুজ বিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার হল হাইব্রিডবীজ। যার জন্য প্রয়োজন প্রচুর জল, রাসায়নিক সার, বিষ। এতে পরিবেশ, স্বাস্থ্য দূষিত হবে একথা এখন সবাই জানে। কিন্তু অন্য যে বিপদ এর সঙ্গে আসছে তা হল প্রচুর খরচ, এই খরচ সামলানোর জন্য ঋণ। ঋণের জন্য ভারতে কৃষকের আত্মহত্যা। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে জমি থেকে উৎখাত হওয়ার ঘটনা। ছোট চাষি ঋণের দায়ে ক্রমশ প্রান্তিক চাষিতে পরিণত হচ্ছে। প্রান্তিক চাষি পরিণত হচ্ছে ভূমিহীনে। নিন্দকেরা বলছে সবুজ বিপ্লব শুধু হাইব্রিড বীজে থেমে থাকবে না। জিন পরিবর্তিত ফসলও এর সঙ্গে ফেউ হিসেবে আসছে। কেউ কেউ বলছেন এ হল কৃষি-সংস্কৃতি থেকে কৃষি -শিল্পে 'উত্তরণ-এর এক ভয়ংকর নীল-নকশা। না হলে সরকার সবুজ বিপ্লবের ভয়াবহ অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে কী করে বছরের পর বছর এ কাজে অর্থ বরাদ্দ করেছে। গ্রামোন্নয়ন রিপোর্টে একদিকে যেমন মানুষের অংশগ্রহণ, প্রাকৃতিক সম্পদকে সামূহিক সম্পদ বলা হচ্ছে। অন্যদিকে কৃষি রাজ্য তালিকায় থাকলেও তা কেন্দ্রীয় সরকার বীজ, জিনফসল, জৈব প্রযুক্তি, জল ও জমির আইনের মাধ্যমে তা কুক্ষিগত করতে চাইছে বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। সরকারে মুখ আর মুখোশ নিয়ে তাই ধন্দ থেকেই যাচ্ছে।

জৈব কৃষি ভাণ্ডার
পারথপ্রতিমা ।। গঞ্জের বাজার ।।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
নারায়ণ বেরা ৭৭৯৭১৮৮৬২৪

.....

আমাদের মানভূম
ক্রোশজুড়ি ।। সোনাথলি ।।
পুরুলিয়া
গৌতম মণ্ডল : ৮৩৪৮৮৬০৩২৭

জৈব চাষের উপাদান-উপকরণ, ফসল ও পরিবেশমুখী জীবনধারার বিবিধ দ্রব্য বিপণনের সমান্তরাল-ব্যবস্থা তৈরি নিয়ে, আমাদের এক নিরীক্ষা কয়েক দশক ধরে চলছে। এই নিরীক্ষা তেমন গ্রামে চলছে তেমন চলছে ও শহরে। ফল বলছে, এইসব দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ও জোগান এখনো এই বঙ্গে বিপুল নয়। এই ধরনের উদ্যোগে উৎসাহীজনও এখন অব্দি গুটিকয়। তবে আগামীদিনে এই সংখ্যা কেমন হবে বলা যায় না।

এবার আমরা এখানে এমন দুই কেন্দ্রের কথা বললাম। কেন্দ্র দুটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পুরুলিয়ায়। কেন্দ্রগুলির যোগাযোগের বিশদ ও দূরভাষ দেওয়া রইল জিজ্ঞাসুর জন্য।

রবি মরশুমের পরিকল্পনা

বীরভূম

• ২৫০ বিঘায় নাইজার, ছোলা, সরষে, তিসি, গম, ঘেসোমটর, মটরশুঁটি, মশুর, কুলতি, মুলোর মিশ্র চাষ ।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া

নানা ফসলের মিশ্রচাষ

• পয়রা : ২৫০০ বিঘায় সরষে, খেসারি, মশুর,নাইজারের পয়রা। পয়রা করা হয় ধান কেটে নেওয়ার পর মরশুমি পতিত জমি কমানোর জন্য।

• খেজুর গুড়, নিমতেল- নিমখোল তৈরি, বাবুই ঘাসের জিনিস তৈরি, বড়ি, আচার, মশলা তৈরি, আলু, বাঁধাকপি শুকানো ।

সুন্দরবন

• সুন্দরবন বোরো চাষে SRI-এর ব্যবহার করা হবে, যাতে মাটির নীচের জলের ব্যবহার কমবে। বীজ কম লাগবে।

• বাগানগুলিতে মিশ্রচাষ, মাচা ও মাল্চসহ নানা পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। জমিয়ে রাখা বৃষ্টির জল ব্যবহার করা হবে এই মরশুমে।

• প্রতিটি বাগানি মাশরুম চাষ করবে। পুষ্টির গুরুত্ব বাড়াবে।

• মাটি ও জল সংরক্ষণের কাজ করা হবে। এমজি এনআরইজিএম-এর কাজে লাগিয়ে। পাশাপাশি বীজ সংরক্ষণের কাজ চলবে।

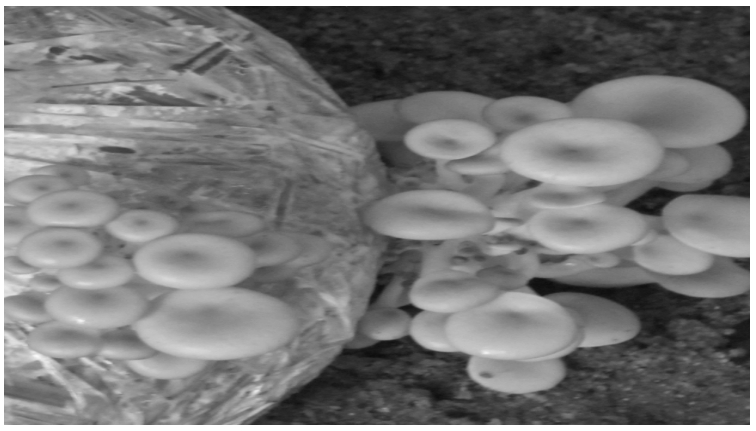

যোগাযোগ : ৯৪৩৩৩৯০৮২৯ ।। ৯৮৩৬৯৫২৩৮১

বিতর্কমুখর উন্নয়ন

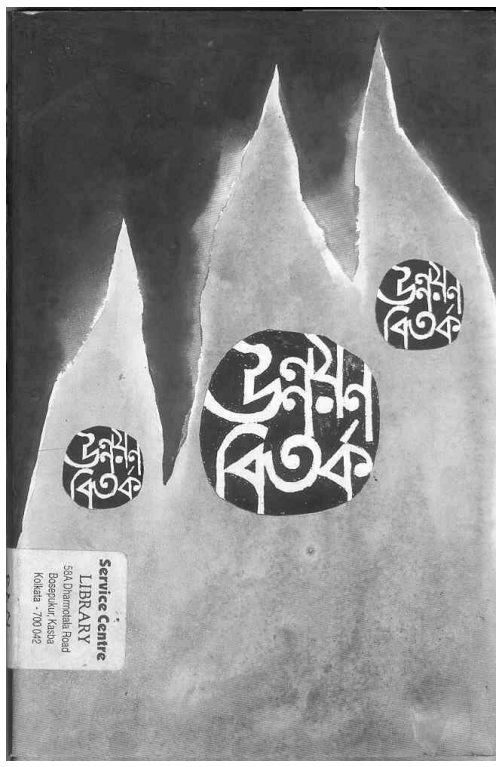

২৬৪ পাতার একটা উন্নয়ন নিয়ে বই। বইটার নাম উন্নয়ন বিতর্ক। বইটাতে উন্নয়ন নিয়ে ১৩টা লেখা আছে। লেখাগুলোর ভেতর কিষান সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি,পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ প্রশাসন, পরিবেশ চেতনা, উন্নয়ন সন্ত্রাস,কেমিক্যাল হাব ইত্যাদি লেখাগুলো পড়া দরকার। লেখকসূচির সিংহভাগ কীর্তিময় অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিদ। যার ভেতর আশিস নন্দী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অজিতনারায়ণ বসু ও অমিত ভাদুড়ীও আছেন। বারবার পড়তে হয় একুশ শতকের কিষান সংস্কৃতি, ভিন্ন এক উৎপাদনী সম্পর্কের সন্ধানে, পরিবেশ চেতনায় উন্নয়ন, উন্নয়ন ভাবনায় একমাত্রিকতার দাপট শীর্ষক চার নিবন্ধ। বইটার প্রকাশক চর্চাপদ। দাম ২৫০ টাকা । বইটা আমাদের লাইব্রেরিতেও আছে।

উন্নয়ন বিতর্ক ।।
প্রকাশক : চর্চাপদ, ১৩ বি রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা ১২ ।।

অনিকেত

আমরুলী শাক

নিজে থেকেই জলাজমিতে জন্মায়। ছোট গুল্ম। চাষ করতে হলে গরমকালে বীজ বা লতার টুকরো ভিজে জমিতে লাগাতে হয়।প্রায় সারাবছর পাওয়া যায়।

আমরুলী শাক খেতে টক। কাঁচা বেটে খাওয়া যায়, রান্নাও করা যায়। সেদ্ধ করে ভাতে মেখে খেলে খিদে বাড়ে-শক্তি বাড়ে, হজম করায়, অম্বল রোগ ভালো হয়। আমরুলী ১ চামচ করে খাওয়ালে শিশুদের বুকে জমা সর্দি বার হয়ে যায়, প্রস্রাব হয়, চুলকানি সারে। ■

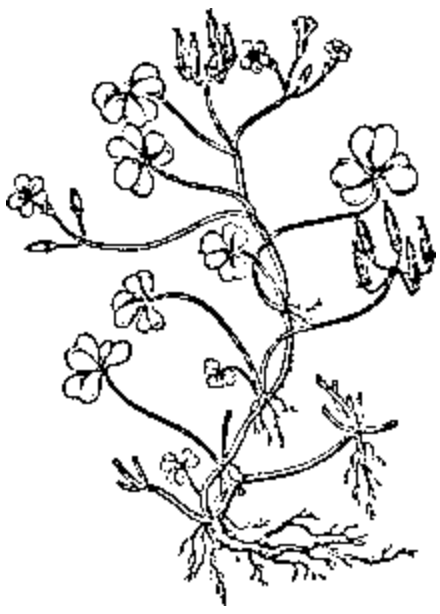

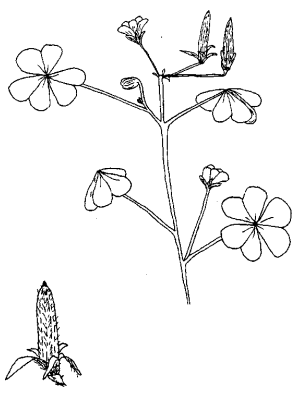

সূত্র : বাংলার শাক

জৈব চাষের সমাচার

কৃষক আনন্দমোহন মন্ডল। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার মল্লিকপুরে। মল্লিকপুরের গ্রাম পঞ্চায়েতও মল্লিকপুর। ব্লক ও থানা স্বরূপনগর পরিবারে আছে পাঁচজন, নিজেরা দুজন, মা-বাবা ও দুই মেয়ে।

জমি ৮ বিঘে। ৮ বিঘের ভেতর এক অংশের গঠন পরিবর্তন করেছেন। এই অংশে একটা ছোট পুকুর আছে। পুকুর ছাড়া বাকি জায়গায় ধান হয়। ধান হয় খরিফে। ধান ছাড়া ডাল, পাট, তিল, সরষে ও সবজি হয়। পুকুরে মাছ হয়।

জৈব চাষে এসেছেন ২০০৫-এ। এই চাষে উৎসাহ পান স্বনির্ভর থেকে। জৈব চাষ নিয়ে স্বনির্ভরে প্রশিক্ষণ নেন। তবে ২০০৫ থেকে ২০০৭ তিনি রাসায়নিক চাষ পুরোপুরি ছাড়েননি। জৈব-রাসায়নিক মিলিয়ে মিশিয়ে করেছেন। তবে রাসায়নিক কম দিয়েছেন। তিন বছরে আস্তে আস্তে জৈব চাষে আসার কারণ উৎপাদন কম হওয়ার সম্ভাবনা ও সংসার -নির্বাহে ঘাটতির ভয় ।

জমিতে ব্যবহার করেন কেঁচোসার ও নিমছাল-নিমপাতা, মেহগিনি ফল, কালমেঘ পাতা-ভাটপাতার কীটনাশক। ব্যবহার করেন ফেরোমেন ট্র্যাপ।

বারোমাস চাল, ডাল, তেল কিনতে হয় না। সব ফসলই বাজারে বিক্রি করেন। এবছর সরকার তরফে ‘কৃষক রত্ন’ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। শ্রী মণ্ডল চাষের প্রশিক্ষণও দেন। ■■

খোঁজ
৯৭৩৩৫৩৮৬০৩
সংগ্রহ আগস্ট ২০১৩

ফসলহানির সম্ভাবনা

উষ্ণায়ন থেকে নতুন বিপদ। শস্যকীট পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডল ছেড়ে হিমমণ্ডলের দিকে চলে যাচ্ছে। ফলে হিমমণ্ডলে ফসলহানির সম্ভাবনা। কীটের চলার গতি বছরে প্রায় তিন কিলোমিটার। একদল বিজ্ঞানী ছশো বারোটি শস্যকীটের ওপর পঞ্চাশ বছর ধরে এই গবেষণা চালিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত সেই গবেষণার ফল।

কাঠের বিপদ

দেশে কাঠের বিপুল চাহিদা। বাড়ছে বনদখল। চলতি দশকে গোলাকার কাঠের ব্যবহার সাতকোটি ঘনমিটার ছাড়াবে অনুমান। এই সংখ্যা, সাড়ে তিন লক্ষ বড় জাহাজ তৈরিব কাঠের পরিমাণেব কাছাকাছি। দেশে কাঠ আছে দেড় কোটি ঘনমিটার, বাকিটা আমদানি। ফল, অন্য দেশের জৈব বৈচিত্র নাশ।

সবুজ মরুভূমি

বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ায় সবুজ বাড়ছে। কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ায় মরুভূমি সবুজ হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, নর্থ আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ১১ শতাংশ শুখা এলাকা এভাবে সবুজ হয়েছে। স্যাটেলাইটে পৃথিবীর শুখা ভু-প্রকৃতির এমন ছবি এসেছে। খবরটা দিয়েছে জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার্স।

জৈব বৈচিত্র পাঠক্রমে

পাঠক্রমে জৈব বৈচিত্র নথির কথা। নথির কথা প্রাথমিক শিক্ষা পাঠক্রমে। এর জন্য বাছা হয়েছে কেরলকে। কেরলের ফলাফল দেখে সারা দেশে তার ব্যবহার হবে। কেরলে এই কাজের পিছনে আছে কেরল স্টেট বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড ও স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং। আর জাতীয় স্তরে এর উদ্যোগী ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড।

গাছ বাঁচাতে টেলিফোন

গাছ বাঁচাতে টেলিফোন। এই উদ্যোগ গুজরাটের আমেদাবাদে। ওখানে পুরসভা শহরে এলাকা ধরে ধরে ফোন নম্বরের ব্যবস্থা করছে। এলাকায় কোনো গাছে পোকা লাগলে, গাছের সার-জল দরকার হলে বা কোনো গাছের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বিবিধ সমস্যা ফোনে নাগরিক পুরসভাকে জানাবে। পুরসভা সেইমতো ব্যবস্থা নেবে। পুরসভা এই নিয়ে নাগরিকের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাও করছে।

দিল্লিতে লেক কমছে

দিল্লি থেকে ২৯ লেক উধাও। এই হিসেব ১৯৯৭-৯৮ থেকে আজ অব্দি। লেক উধাও এর কারণ, জমি দখল করে বাড়ি ও লেকের শুকিয়ে যাওয়া। ১৯৯৭-৯৮ অব্দি দিল্লিতে লেক ছিল ৪৪টি। হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি রিঠাশশ, পিদমপুরা, বিষ্ণুগার্ডেন প্রভৃতি অঞ্চলে।

মশলা রফতানির সর্বনাশ

দেশে মশলা ব্যাবসায় দুর্দিন। ব্যাবসায় রফতানির বরাত কমছে। বরাত কমছে আমেরিকায়। ওদেশে ভারতীয় মশলায় বিষ- ব্যাকটিরিয়া মিলেছে। ব্যাকটিরিয়ার নাম স্যালমোনেল্লী। বিষ-মশলা দিয়ে বিষ ঢুকছে খাবারে। তাই ভারতীয় মশলা মার্কিন লাল তালিকায়। তালিকা মার্কিন ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের। গুঁড়োলংকা, জিরা, হলুদসহ এই তালিকা বেশ দীর্ঘ।

মাছ ধরায় বিপদ

মোটরচালিত ও যান্ত্রিক মাছ ধরায় গ্রিন হাউস গ্যাস বাড়ছে। বলছে, বিশাখাপত্তনমের সেন্টাল ইনস্টিটিউট অফ ফিশারিজ টেকনোলজি। বলছে, এই বৃদ্ধির পরিমাণ কম হলেও উপেক্ষার নয়।

বনের ভেতর হোটেল ?

গির স্যাঙ্কচুয়ারিতে হোটেল। পাঁচ বছর আগে ওখানে হোটেল সংখ্যা ২৫ ছিল। এখন তা সংখ্যায় ৩৪। জঙ্গলের ভেতরের অনেকগুলো খামারবাড়ি হোটেল হয়ে গেছে। এই বছর এখন অব্দি জঙ্গলে ঢুকেছে ৪১৬,০০০ ভ্রমণার্থী। জঙ্গলের ২ কিলোমিটার ব্যাসার্ধে বন দফতর এই ধরনের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করেছে। দফতর বেআইনী হোটেল ভাঙবে বলে ঠিক করছে।

আরে ভাবুন!

দেশের কৃষক নেতাদের মতে, কম উৎপাদনই কৃষি সংকটের একমাত্র কারণ নয়। অন্য জিনিসের মতো সমহারে কৃষিপণ্যের দাম বাড়ছে না। ভারতীয় কিষান ইউনিয়ন উদাহরণ দিয়ে বলছে, ১৯৬৭ থেকে আজ অব্দি ডিজেলের দাম বেড়েছে একশো বাইশ গুণ, শ্রমিকের বেতন বেড়েছে একশো পঁচিশ গুণ, অথচ গমের দাম ওই সময়ে বেড়েছে মাত্র আঠেরো গুণ।

হতে পারে

প্রথম লোকসভায় সাতাশি জন সদস্য কৃষির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। দ্বাদশ লোকসভায় সংখ্যাটা বেড়ে হয় দুশো একষট্টি। আর বর্তমান লোকসভায় দুশো বাইশ জন সাংসদ কৃষির সঙ্গে যুক্ত। তথ্য ইঙ্গিত করে,যদিও অনেক সদস্যই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কৃষিজমির মালিক এবং কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ,তবুও আয়ের প্রধান উৎস কৃষি এমন সাংসদের সংখ্যা নিম্ন মুখী। সংশয়, বিষয়টি সরকারি স্তরে কৃষিতে অবহেলার সম্ভাব্য কারণ।

রাসায়নিক সারের আমদানি

চাষের জন্য যথাক্রমে ৯০ ও ১০০ শতাংশ ফসফেট ও পটাশ সার আমদানি করতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। কারণ দেশে সীমিত পরিমাণ রক ফসফেট থাকলেও তা গুণমানে খুব উন্নত নয়। উদাহরণ পুরুলিয়া ফস। তবে ইউরিয়া উৎপাদনে দেশ স্বনির্ভর হতে পারে। এজন্য সরকার নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। একথা গত ২৩ অগস্ট রাজ্যসভায় জানিয়েছেন সার ও রসায়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত জেনা। মাননীয় মন্ত্রীর এই কথা কেন সারের দাম ক্রমশ বাড়ছে তার খানিক ইঙ্গিত দেয়। কারণ বেশিরভাগ সারের জন্য আমাদের পরের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় সরকার হয়তো খুঁজছে। কিন্তু বিকল্পের জন্য আমাদের তরফ থেকেও উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

সুস্থায়ী কৃষির প্রসারে সরকার

জলবায়ু বদলের প্রভাব ইতিমধ্যেই ভারতের কৃষিতে পড়তে শুরু করেছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চ (আইসিএআর) ফসল উৎপাদনে জলবায়ু বদলের প্রভাব নিয়ে একটি বিস্তৃত সমীক্ষা করে এর প্রমাণ পেয়েছে। আইসিএআর বলছে, এর ফলে ২০২০ সালের মধ্যে শুধু সেচসেবিত ধানের উৎপাদন ৪ শতাংশ ও বৃষ্টি নির্ভর ধানের ৬ শতাংশ ফলন কমে যেতে পারে।

আইসিএআর এজন্য ন্যাশনাল প্রজেক্ট ইনিসিয়েটিভ অন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট অ্যাগ্রিকালচার (জলবায়ু বদল সহনশীল কৃষি বিষয়ক জাতীয় উদ্যোগ) নামে একটি কর্মসূচি নিয়েছে। এছাড়া ন্যাশনাল মিশন অন সাসটেনেবল অ্যাগ্রিকালচার (জাতীয় সুস্থায়ী কৃষি মিশন)-এর একটি নথি তৈরি করা হয়েছে যা জলবায়ু বদল বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর কাউন্সিল নীতিগতভাবে সমর্থন জানিয়েছে। এই মিশন সুস্থায়ী কৃষির ১০টি প্রধান দিক নির্দিষ্ট করেছে। যা চারটি কার্যক্রম যেমন গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রযুক্তি নির্বাচন, প্রয়োগ ও উৎপাদন এবং পরিকাঠামো ও দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হবে। বর্তমানে কৃষি বিষয়ক যেসব প্রকল্প, পরিষেবা, কার্যক্রম সরকারের রয়েছে তার মাধ্যমেই এই মিশন রূপায়ণ করা হবে। এসব কথা রাজ্যসভায় জানিয়েছেন খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী তারিক আনোয়ার।

সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু
সম্পাদনা সহযোগী : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
হরফ : শিপ্রা দাস রূপ : অভিজিত দাস
মুদ্রাকর : লক্ষ্মীকান্ত নস্কর

Book Post
Printed Matter

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সোমজিতা চক্রবর্তী কর্তৃক ১৮বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
যোগাযোগ : প্রজেক্ট অফিস, ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৪২, দূরভাষ : ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৪৪২ ৭৫৬৩
ই-মেল : drcsc.ind@gmail.com, www.drcsc.org